সৈয়দ শামসুল হকের ছোটোগল্পে মধ্যবিত্ত জীবনসংকট

নাহিদা বেগম*

[সারসংক্ষেপ : ক্রমবর্ধমান নগরায়ণ প্রক্রিয়ায় নব্যসৃষ্ট উঠতি মধ্যবিত্ত শ্রেণির কথাকার সৈয়দ শামসুল হক (১৯৩৫-২০১৬)। সাহিত্যে সৈয়দ শামসুল হক মধ্যবিত্তকে ব্যবহার করেছেন তাদের বহুভঙ্গিম জীবন ও বৈচিত্র্যময় অনুষঙ্গের পরিপ্রেক্ষিত বিবেচনায়। 'মধ্যবিত্ত' শব্দটি অর্থনৈতিক সক্ষমতার ওপর ভিত্তি করে সমাজের এমন একটি বিশেষ শ্রেণিস্তরের নাম যার উপরে এবং নিচে আরও একটি করে শ্রেণি বা স্তর বিরাজমান। এই শ্রেণির ব্যক্তিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রিক অভিযোজন তুলনামূলক অন্যান্য শ্রেণির তুলনায় নাজুক ও সংকটময় বলেই সাহিত্যতত্ত্বে তাদের আর্থিক, নৈতিক ও মনস্তাত্ত্বিক সংকটকে গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করা হয়। তাদের মননগত অন্তর্বেদনা, কাম, রিরংসা, বিশ্বাস-অবিশ্বাস, স্বপ্ন-প্রত্যাশার মতো প্রভাববিস্তারী অনুভূতিগুলো পরিবার ও সমাজে ইতি-নেতি যে বহুরৈখিক জীবনধারার সৃষ্টি করে তা নিঃসন্দেহে কখনো সংঘাতময় কখনো আনন্দময়। এই গবেষণার ক্ষুদ্র পরিসরে সৈয়দ শামসুল হকের ছোটোগল্পের মধ্য থেকে মধ্যবিত্ত শ্রেণির দ্বান্দ্বিক অবস্থান, হতাশা, দৈন্য, ব্যর্থতার মতো জীবনসংকটের নানারূপ প্রাসঙ্গিক বিষয়াদি এবং তৎসংশ্লিষ্ট সীমাবদ্ধতার ক্ষেত্র অনুসন্ধানের প্রয়াস দেখানো হবে]

পঞ্চাশের সবচেয়ে প্রতিভাদীপ্ত গল্পকার সৈয়দ শামসুল হক। বস্তুত তাঁর ছোটোগল্প সমকালীন অন্য গল্পলেখকদের থেকে বিষয়ভাবনা ও জীবনবৈচিত্র্যে স্বকীয়। কথাশিল্পী সেলিনা হোসেন সৈয়দ শামসুল হক সম্পর্কে মন্তব্য করেছিলেন– 'তিনি তো সেই লেখক যিনি জীবনকে দেখেছেন বোধের মগ্নতায়, দেখেছেন মননের শস্যক্ষেত্রে, দেখেছেন প্রেমের কল্পনায়, দেখেছেন ঔজ্জ্বল্যে, বিবর্ণতায়, ধ্বংসে, যুদ্ধে, প্রতিরোধে, ভালোবাসায়, সঙ্কটে এবং সামগ্রিক সত্যে' (সেলিনা, ২০১৫ : ২২৯)। কবিতা, নাটক, কথাসাহিত্য প্রবন্ধ-নিবন্ধ, শিশুতোষ রচনাসহ সাহিত্যের সকল ক্ষেত্রেই শিল্পকর্ষণের উৎকর্ষে তাঁর নামের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে সব্যসাচী বিশেষণ। স্বকালে তিনি যেমন আপন প্রজ্ঞায় আলোচিত ছিলেন তেমনি কালোত্তীর্ণ যাত্রায় তাঁর শিল্পপুঁজি পূজিত হওয়ার যোগ্যতা রাখে আপন গৌরবে। আমাদের আর্থ-সামাজিক বিবর্তনের প্রতিটি বাঁক, আবহ, ঘটনা এমনকি সমসাময়িক চরিত্র তাঁর কবিতায় যেমন উঠে এসেছে স্বতঃস্ফূর্ত প্রক্রিয়ায়, তেমনি তীক্ষ্ণভাবে পরিপার্শ্বকে পর্যবেক্ষণের স্বোপার্জিত প্রবণতা তাঁর গল্প-উপন্যাসে চিহ্নিত হয়েছে বাস্তব সত্যে (খালেদ হোসাইন, ২০১৯ : ২৭৮)। রোমান্টিক ভাববিলাস, উত্তুঙ্গ চেতনার পরিবর্তে মনোবাস্তবতার গভীরতর সংকট, বাহ্যিক-অন্তর্লোকের সমান্তরাল ক্ষরণ এবং সামাজিক প্রেষণের পরিপ্রেক্ষিতে বিপর্যস্ত মানবজীবনের অসঙ্গতিগুলো সংকটরূপে অবলোকন করে সেখান থেকে মধ্যবিত্তশ্রেণির জীবনভাষ্য নির্মাণে সৈয়দ শামসুল হক ছিলেন তাঁর নিজস্ব শিল্পভুবনের সমৃদ্ধ কথাশিল্পী।

ইতিহাসের সাক্ষ্য অনুযায়ী যেদিন থেকে মানুষ সমাজবদ্ধ হয়েছে সেদিন থেকে উৎপত্তি ঘটেছে শ্রেণি ধারণার। বলা হয়–

> The history of all hitherto existing society is the history of class struggles. Freeman and slave, patrician and plebeian, lord and serf, guild-master and journeyman, in a word,

* সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়।

> oppressor and oppressed, stood in constant opposition to one another, carried on an uninterrupted, now hidden, now open fight, a fight that each time ended, either in a revolutionary re-constitution of society at large, or in the common ruin of the contending classes. (Marx Karl & Engles Friedrich 2018:09)

লেনিন মতে 'শ্রেণি বলতে বোঝায় সেই সামাজিক গোষ্ঠীগুলিকে যাদের মধ্যে একগোষ্ঠী অর্থনীতিতে নিজ অবস্থানের জোরে অপর কোন গোষ্ঠীর শ্রম আত্মসাৎ করতে সক্ষম' (শোভনলাল দত্তগুপ্ত, ১৯৯০ : ১৩২)। সমাজবিজ্ঞানী ওয়েবার কার্লমার্কসের মালিকশ্রেণি ও শ্রমিকশ্রেণি ধারণার বিশ্লেষণ ও ব্যবহারিক প্রয়োগ আলোচনা করতে গিয়ে এই দুই শ্রেণির মধ্য-মধ্যবর্তী আরো একটি শ্রেণির কথা বলেছেন, তার মতানুসারে শুধু এই দুই শ্রেণিতে সমাজের সকলকে ফেলা যায় না, সমাজে অনেক লোক আছে যারা উৎপাদন পদ্ধতির সাথে সরাসরি যুক্ত নয় কিন্তু তাদেরও আলাদা শ্রেণিতে বিবেচনা করতে হয়। তাদের শ্রেণি নির্ধারণের প্রচেষ্টা থেকেই সমাজতত্ত্বে মধ্যবিত্ত শ্রেণি ধারণাটি উদ্ভব।

সরল সংজ্ঞায়নে মধ্যবিত্ত শ্রেণির বর্ণনা প্রদান দুরূহ ব্যাপার। সাধারণত কিছু বৈশিষ্ট্যের আদলে মধ্যবিত্ত শ্রেণির অবয়ব কল্পনা করা হয়। যেমন– 'The majority of middle class people work for a living and do no involve manual labour.They include those of bussiness woners and managers, clerks, lawyers, doctors and teachers' (মো: মুস্তাফিজুর রহমান, ২০০৯ : ০২)। অর্থাৎ কায়িক শ্রম পরিহারকারী ও অপরের শ্রম আত্মসাৎকারী অথবা কায়িক শ্রমজীবীদের শ্রমের ওপর প্রধানত নির্ভরশীল এবং প্রচুর বিত্ত বা বৃহদায়তন উৎপাদন উপকরণের মালিকহীন ব্যক্তিরাই মধ্যবিত্ত শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত। (মুহম্মদ ইদরিস আলী, ১৯৮৫ : ০২) এ প্রসঙ্গে আর এইচ গ্রেটেনের মনোভাব মধ্যবিত্ত শ্রেণির বিশ্লেষকরা গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করেন। তিনি মধ্যবিত্ত শ্রেণির সংজ্ঞার্থ প্রদান করতে গিয়ে মুদ্রানির্ভর শ্রেণিকে মধ্যবিত্ত হিসেবে নির্দেশ করছেন। তিনি মনে করেন মুদ্রা যাদের প্রধান নিয়ামক ও প্রাথমিক উপাদান তারাই মধ্যবিত্ত শ্রেণির মানুষ (বিনয় ঘোষ, ২০১৬ : ৭৫) মধ্যবিত্তের অবস্থা সব সময় অস্থিতিশীল। তারা যেকোনো সময় অধিক সম্পদ আহরণ করে ধনিক শ্রেণিতে উন্নীত হতে পারে আবার স্ব-অবস্থান হারিয়ে সর্বহারা শ্রেণিতেও অবনত হতে পারে। মধ্যবিত্ত শ্রেণির ইংরেজি প্রতিশব্দ Middle class। পাশ্চাত্যের সমাজতত্ত্ববিদরা middle class-কে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে দেখেছেন। যেমন গোল্ডথরপ middle class-কে service class হিসেবে দেখেছেন। মার্কসবাদীরা দেখেছেন 'new working class' হিসেবে। গর্ডন মার্শাল 'middle class' পরিভাষাকে 'the least satisfactory term' বলে আখ্যা দিয়েছেন। (অনির্বাণ বন্দ্যোপাধ্যায়, ২০১৭ : ২)। সাধারণভাবে, 'বুর্জোয়া' ও মধ্যবিত্ত শ্রেণি সমর্থক হিসেবে ব্যবহৃত হয় (আবদুল মওদুদ, ২০১১ : ৫৫)। বুর্জোয়া শব্দটি ফরাসি Burgh থেকে উদ্ভূত (জিনাত আরা হক, ২০১৪ : ১৫৪) যার অর্থ নাগরিক, মধ্যবিত্ত শ্রেণি, ব্যবসায়ী বা ছোটো দোকানদার। মধ্যবিত্ত শ্রেণির সীমিত চিহ্নিতকরণের শক্ত মাপকাঠি হিসেবে ব্যবহৃত হয় শিক্ষা এবং চাকুরি। কখনো কখনো মধ্যবিত্ত শ্রেণিকে সুবিধাভোগী বলে ধরে নেওয়া হয়। কারণ, এই শ্রেণির লোকেরা অল্প পরিশ্রমের মাধ্যমে তাদের সামাজিক অবস্থা এবং আর্থিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করে থাকে (ড. গোলাম কিবরিয়া ভূঁইয়া, ২০১৩ : ১৮) সমাজবিজ্ঞানীরা বিভিন্ন গবেষণায় মধ্যবিত্তের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য নিয়ে দীর্ঘ প্রেক্ষাপটে আলোচনা করেছেন। সে সকল আলোচনার সারকথা এই– মধ্যবিত্ত হচ্ছে আকৃতিহীন এমন কিছুসংখ্যক গরিষ্ঠ মানুষ যারা ভালো পোশাক-পরিচ্ছদ ও বাহ্যিক আচরণে ভদ্রলোক হতে চায় বলেই পারিবারিক ও

সামাজিক জীবনের প্রতি দুর্বল থাকে, তারা মানবীয় গুণাবলি প্রকাশে আগ্রহী। পরিবার ও সন্তান প্রতিপালনে যত্নশীল। শিক্ষাকে কাজে লাগিয়ে তারা উন্নত জীবন লাভের চেষ্টায় সর্বদাই সংগ্রামরত এমনকি বস্তুগত সম্পত্তির মালিক হওয়ার সাধ থাকা সত্ত্বেও সামাজিক মূল্যবোধ রক্ষায় তারা সর্বোচ্চ ত্যাগ স্বীকার করে। মধ্যবিত্তের রয়েছে উন্নত রুচি ও সংস্কৃতি পরিচর্যার আকাঙ্ক্ষা। দেশের সংকট সময়ে তারা যে কোনো স্বৈরশাসনের বিরুদ্ধে প্রতিরোধে কণ্ঠ সোচ্চার করার সাহস রাখে। কিন্তু শ্রমবিমুখতা, পলায়নপরতা, স্বার্থপরতা, পরমুখাপেক্ষিতার মতো নেতিবাচক মনোভাবের কারণে সমাজে এই শ্রেণির নানারকম ভূমিকা থাকার পরও অপর দুই শ্রেণি কর্তৃক প্রায়ই নিন্দিত হয়ে থাকে। সর্বোপরি সমাজকে গতিশীল রাখার পেছনে মধ্যবিত্তের সার্বিক ভূমিকা কল্যাণকর এবং বুদ্ধিবৃত্তিক চর্চায় তারা প্রাগ্রসর বলেই পরিবর্তনমুখী সমাজ বিকাশে মধ্যবিত্ত শ্রেণির গুরুত্ব অপরিসীম।

পুঁজিবাদ বিকাশের প্রাথমিক পর্যায়ে ইংল্যান্ডে যাজক, সামন্ত শ্রেণি ও শ্রমিক শ্রেণির মধ্যবর্তী পুঁজিপতি ব্যবসায়ী ও শিল্পপতিরা মধ্যবিত্ত শ্রেণি হিসেবে চিহ্নিত হতো। (বদরুদ্দীন উমর, ১৯৮৮ : ১০) আদিতে ইংল্যান্ডে মধ্যবিত্ত শ্রেণি বলতে একটা বিশিষ্ট ঐতিহ্যবাহী সমাজকে বোঝানো হতো। প্রথমত, আর্থিক বিন্যাসে তারা ছিল মধ্যবর্তী স্তরের পুঁজিপতি এবং মজুর শ্রেণির তুলনায় উন্নত। তারা বিভিন্ন পেশায় নিয়োজিত থাকত, কিন্তু তাদের জীবনযাত্রার মান ও আচার-ব্যবহার হতো একই ধরনের। দ্বিতীয়ত, তারা কতকগুলো উদার গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের অনুসারী ছিল এবং সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপে তাদের এ মূল্যবোধ প্রকাশ পেত। (আবদুল মওদুদ, ২০১১ : ৫৬)। ইংল্যান্ড বা পাশ্চাত্যের হিসেব যাই হোক পূর্ববঙ্গে মধ্যবিত্ত শ্রেণির উদ্ভবের পিছনে রয়েছে কিছু ইতিহাস, তার মধ্যে প্রধানতম কারণ দেশভাগ, স্বাধিকার আন্দোলন ও নগরায়ণ প্রক্রিয়া। বাংলা ভাষায় 'মধ্যবিত্ত' শব্দের আবির্ভাব হয় উনিশ শতকের প্রারম্ভে। উনিশ শতকের মাঝামাঝি থেকে এটি বাংলার শিক্ষিত সমাজে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হতে থাকে। এটি তখন ভদ্রলোক শব্দের সমার্থক ছিল। (বিলকিস রহমান, ২০১৩ : ৭)

যে কোনো আধুনিক সমাজে মধ্যবিত্তকে মূলত চারটি উপবিভাগে বিন্যস্ত করা যায়–

ক. বাণিজ্যিক মধ্যবিত্ত
খ. শিল্পাশ্রয়ী মধ্যবিত্ত
গ. ভূমিনির্ভর মধ্যবিত্ত
ঘ. পেশাজীবী মধ্যবিত্ত
(মুহম্মদ ইদরিস আলী, ১৯৮৫ : ৩)

মধ্যবিত্ত যত বেশি আধুনিকতার দিকে অগ্রসর হয়েছে ততবেশি শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতির প্রতি ঝুঁকেছে এবং একসময় তাদের সহজাত আত্মপ্রকাশের মাধ্যম হয়ে উঠেছে গদ্য বা কথাসাহিত্য। (মুহম্মদ ইদরিস আলী, ১৯৮৫ : ৭১) বিভাগপূর্বকালে সমকালীন ছোটোগল্পে মধ্যশ্রেণির উপস্থিতি তেমন প্রকট আকারে না থাকলেও পঞ্চাশের দশক থেকে বিক্ষুব্ধ রাজনীতি থেকে সামাজিক শ্রেণি বিন্যাসে অর্থনৈতিক দিক থেকে সমাজে বসবাসরত শাহরিক মধ্যবিত্তের জীবন ছোটোগল্পকারদের রচনায় প্রাধান্য পেতে শুরু করে। বলা যায়, আধুনিক ছোটোগল্পের জগৎ নাগরিক মধ্যবিত্তের স্বপ্ন, সংগ্রাম আর নানাবিধ টানাপড়েনের ওপর ভিত্তি করেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। পূর্ববাংলার মানুষ যখন নগর জীবনের পরিপ্রেক্ষিতে নানামাত্রিক অভিনব অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হয়েছে, সৈয়দ শামসুল হকই তখন প্রথমবারের মতো সেই নাগরিক মধ্যবিত্তের

সঙ্কট-সম্ভাবনা, হতাশা আকাঙ্ক্ষাকে সফলভাবে তাঁর গল্পের উপজীব্য করেছেন (আহমাদ মোস্তফা কামাল, ২০১৫ : ২৬৮) সৈয়দ শামসুল হকের প্রথম গল্পগ্রন্থ *তাস* (১৯৫৪)। প্রথম গল্পগ্রন্থ থেকে শুরু করে *শীত বিকেল* (১৯৫৯), *রক্তগোলাপ* (১৯৬৪), *আনন্দের মৃত্যু* (১৯৬৭), *প্রাচীন বংশের নিষ্ণস্ব সন্তান* (১৯৮২), *জলেশ্বরীর গল্পগুলো*'য় (১৯৯০) মধ্যবিত্তের যে জীবন-সংকট তিনি এঁকেছেন তা গার্হস্থ্য জীবন, পারিবারিক সম্পর্কের জটিলতা অভাব-দারিদ্র্য, নৈঃসঙ্গতার কষ্ট, আত্মগত অন্তর্মুখিনতার সঙ্গে কখনো কখনো সামষ্টিক গভীর সামাজিক সমস্যায় ভারাক্রান্ত। গল্পগুলোতে স্বাভাবিক জীবনের ছোটো-বড়ো সমস্যা ও সমাধানের আকাঙ্ক্ষা কখনো কাব্যের রোমান্টিক বোধে কখনো দার্শনিক জীবনবীক্ষায় প্রশ্ন আকারে উত্থাপিত হয়েছে। কোনো কোনো গল্পে মিশে আছে পূর্বপুরুষ হতে উঠে আসা শ্রেণিগত বন্ধন, কোনোটায় শ্রেণি উত্তরণের চেষ্টা আবার কোনোটায় হিংসা ও বিদ্বেষের ফলে সৃষ্ট মধবৃত্তীয় আবহমান সংকটময় সামাজিক বিভেদ। কোথাও হতাশা, কোথাও নৈরাশ্য। ব্যক্তির নঞর্থক চেতনার রূপায়ণে মধ্যবিত্তকে তিনি কখনো চিহ্নিত করেছেন পশ্চাদপদ হিসেবে। আবার কখনো তাদের ভেতরে দেখিয়েছেন নিজস্ব প্রেরণার সদর্থক দৃষ্টিভঙ্গি। মধ্যবিত্তের শ্রেণিসংগ্রাম ও টিকে থাকার যুদ্ধকে লেখকের মনে হয়েছে এক ধরনের সাহস। সর্বোপরি একক বোধের বিচ্ছিন্নতা ও প্রেম সংক্রান্ত হতাশার স্বাভাবিক প্রবণতায় মধ্যবিত্তের জীবনলক্ষণ চিরন্তন সহজ রূপাঙ্কনে সৈয়দ শামসুল হকের দৃষ্টি সার্থক মনন অভীক্ষায় ঋদ্ধ।

বাঙালি মধ্যবিত্তদের ভেতরে ব্যক্তির ভালো থাকা, মন্দ থাকা নির্ভর করে পরিবারের সদস্যদের ভালো থাকা, মন্দ থাকার ওপর। বেশিরভাগ মধ্যবিত্তই আত্মাউন্নয়ন ব্যাপারটাকে পরিবারের উন্নয়ন হিসেবেই বিবেচনা করে। সন্তানের সুখ স্বাচ্ছন্দ্য সংকট সকল কিছুই বিবেচিত হয় যৌথতার মিশ্র যাপনের অংশ হিসেবে। সৈয়দ শামসুল হকের গল্পের বড়ো একটা অংশ অধিকার করে আছে এই গার্হস্থ্য ও পারিবারিক সংকটে নিপতিত মধ্যবিত্ত শ্রেণি। (মোস্তফা তারিকুল আহসান, ২০০৮, ৪০০) 'হিজল কাঠের নাও' গল্পের হামিদা বানুর সমস্ত চিন্তা তার কন্যা শফিনাজকে পাত্রস্থ করা নিয়ে। হামিদা বানুর সামর্থ্য নেই আত্মজাকে ভালো ঘরে বিয়ে দেবার। তবু মধ্যবিত্ত মায়ের সেই চিরন্তন প্রত্যাশা অনুযায়ী তারও প্রত্যাশা শফিনাজ যেন তার সচ্ছলতায় থাকে; দুধে ভাতে থাকে, ঘর আর বর নিয়ে সুখী হয়। কন্যার ভবিষ্যৎ কল্পনায় হামিদা বানু দেখতে পান—

> ওপাশের উনুনে নিমকি ভাজছে শফিনাজ নিজে। ওর হাতের ময়দা হামিদা বানুর চেয়েও ভালো হয়। এপাশে চায়ের পানিতে বলক উঠছে তাঁর সামনে। আর কি সরল ছেলে দেখো আখতার, প্যান্ট শার্ট সুদ্ধ এসে বসেছে রান্নাঘরের সামনে চৌকাঠের পাশেই। হয়ত বলবো : উঁহু, কেটলিতে আরো খানিকটা চা পাতা ঢালুন, খালা-আম্মা। লিকার একটু কড়া হলেই আমার পছন্দ। আখতারের খালা-আম্মা আরো খানিকটা পাতা ঢেলে দেবেন প্যাকেট থেকে। হাসবেন। আপনজনের মতো হাসবেন। (সৈয়দ শামসুল হক, ২০১০ : ৫২)।

কিন্তু স্বপ্ন তো স্বপ্নই। এই যে সুন্দর সুপুরুষ, সম্ভ্রান্ত বংশীয় আখতারের আগমনে হামিদা বানুর মনোজগতে তৈরি হয়েছে তীব্র প্রত্যাশার ঘোর, তা তাকে অবারিত আকাঙ্ক্ষা পূরণ না হওয়ার আশঙ্কায় মানবিক সংকটের দিকেও টেনে নিতে পারে, আবার কন্যার প্রত্যাশিত জীবন ছোঁয়ার আগ্রাসী ইচ্ছেয় দুর্নিবার ও অসংযমী করে তুলতে পারে যেকোন সময়; এখানে সবই সম্ভাব্য।

সৈয়দ শামসুল হকের 'সিঁড়ি' গল্পটি ভাবগত দিক থেকে 'হিজল কাঠের নাও' গল্পের ঠিক বিপরীত। পরিবারের মধ্যকার বহমান স্নেহ, প্রেম, মমতার আড়ালে যে অসহিষ্ণু অপ্রেম তা এই

গল্পের প্রেক্ষাপট। জাহানারা বাড়ির বড়ো মেয়ে, অবিবাহিত। গল্পে তার ব্যক্তিগত জীবন বলে কিছু নেই। বিএ পরীক্ষার সময় তার বাবা অসুস্থ হয়ে পড়লে সংসারের সমস্ত ভার তার ওপর চেপে বসে। তাদের সংসারে আছে ছোটো ভাই আসাদ, মা আর সে। অসুস্থ বাবাকে নিয়ে অভাবের সংসার টিকিয়ে রাখতে জাহানারাকে নামতে হয়েছে কঠোর সংগ্রামে। সংসারে চাকা সচল রাখতে স্কুলের চাকরিতে রাতদিন পরিশ্রম করে যায়। কিন্তু তার ব্যক্তিগত জীবন নিঃসঙ্গতার। স্বামী, সংসার, সন্তান কামনায় অস্থির হয়ে পড়লেও সংসারের দিকে তাকিয়ে কিছুই করার থাকে না। একসময় বান্ধবী রেশমির সাজানো গোছানো সংসার দেখে সে ভেতরে ভেতরে ঈর্ষাকতর হয়। তার মনোজগতে খেলা করে অদ্ভুত অস্থিরতা।

> বড় নিঃসঙ্গ বড় অসহায় মনে হয়। তার বুকের ভেতরটা যেন শুধু দীর্ঘশ্বাসেই তৈরি। রেশমির কথাগুলো কানে বাজে। একদিন এমন ছিল যেদিন ওরা দু-জনে ছিল দুজনের সহচরী। আর আজ সেই রেশমি? ওর স্বামী নিশ্চয়ই ফিরেছে কলেজ থেকে। সোহাগে রঙিন হয়ে উঠেছে এমন সন্ধ্যা। (সৈয়দ শামসুল হক, ২০১০ : ৫৮)

জীবনের প্রয়োজন অস্বীকার করতে না পারলেও নিজেকে আর লুকানো সম্ভব হয় না জাহানারার। তবু মন আর শরীরের প্রয়োজন উপেক্ষা করে তাকে তাৎক্ষণিক সারা দিতে হয় সংসারের প্রয়োজনে। বিছানায় শুয়ে শুয়ে অনবরত অসুস্থ পিতা ডেকে যায় আর ক্লান্ত বিপর্যস্ত জাহানরা অলস পা ফেলে অতিক্রম করে ঘোরানো প্যাঁচানো সিঁড়ি। এই সিঁড়িটা যেন তার জীবনের পথ। জাহানারা হোঁচট খায়। কিন্তু পড়ে যায় না বা নুয়েও পড়ে না। কারণ সে জানে তাকে শক্ত থাকতেই হবে। বাবার ব্যথার ঔষধ কিনতে হবে। ডাকার সাথে সাথেই বলতে হবে 'আসছি'। নিরূপায় মধ্যবিত্তকে এভাবেই দিনশেষে শুধু বইতে হয় যাপিত জীবনের ভার ও অতৃপ্ততার গভীর কালো দীর্ঘশ্বাস।

মধ্যবিত্ত সমাজে নারীর সকলরকম যোগ্যতার মধ্যে শারীরিক সৌন্দর্যকে বিশেষ বিবেচনায় দেখা হয়। বিশেষ করে নারী নিজেই যখন প্রথাগত সমাজকেন্দ্রিক নির্ধারিত সুন্দর-অসুন্দরের মীমাংসায় নিজের রূপজ অবস্থান নিয়ে থাকে তটস্থ, তখন তার পরিপার্শ্বও ধীরে ধীরে তার প্রতিকূল হয়ে ওঠে। সৈয়দ হকের 'রোকেয়ার মুখ' গল্পে আছে বসন্ত রোগে মুখাবয়ব নষ্ট হয়ে যাওয়া এক মধ্যবিত্ত রমণীর অস্তিত্বের সংকট। স্বামী সন্তান নিয়ে রোকেয়ার ভর-ভরান্তি সংসারে সুখের চেয়ে অসুখ বেশি। বসন্ত তার স্বাভাবিক জীবনের উচ্ছ্বাস কেড়ে নিয়েছে। তার কেবলি মনে হয় তার স্বামী হামিদ একটু একটু করে দূরে সরে যাচ্ছে অজান্তে। নির্বিকার সেই দিনযাপনের ভাষ্য লেখক তুলেছেন এভাবে–

> কিছুক্ষণ পর হামিদ এসেছিল শোবার ঘরে। চেয়ার টেনে বসেছিল, কিন্তু দীর্ঘ একটা ক্ষণ কিছুই সে বলে নি। তার এই নীরবতা রোকেয়াকে আরো একা করে দিয়েছিল।... মনে মনে রোকেয়া প্রার্থনা করেছিল, হামিদ একবার ডাকুক তার নাম ধরে।... কিন্তু তার কণ্ঠস্বরে ছিল চাপা রূঢ়তা। (সৈয়দ শামসুল হক, ২০১০: ৪৩)

মধ্যবিত্তের ভেতরে সব থাকার পরও তুচ্ছ বিষয়ে হীনমন্যতার বোধ তাদেরকে নিঃসঙ্গ করে রাখে আপন গণ্ডিবদ্ধ জীবনের ভেতর ও বাইরে।

মধ্যবিত্ত পরিবারে আছে বিচ্ছেদ হতাশা বা নিঃসঙ্গতার মতো একক কষ্ট। মধ্যবয়সে এসে স্বামী মারা গেলেও দৈনন্দিন গার্হস্থ্যে কারো কারো জীবন আটকে যেতে পারে স্মৃতিকাতরতা আর অপ্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষায়। সৈয়দ শামসুল হকের 'তাস' (১৯৫৪) গল্পটিতে স্বামীহারা এক

বিধবা মায়ের স্মৃতিকাতরতা প্রকাশ্য। একলা রমণীটি তার সংসারের সবটা জুড়ে থাকলেও স্বামীর অভাবে তার জীবন বন্ধন শিথিল, বিঘ্নিত ও বিধ্বস্ত (মোহাম্মদ মোস্তাফিজুর রহমান, ২০০৯ : ৩৩)। এই গল্পে বিধবা মা তার স্বামীর কালের পুরানো ঘড়ির উপস্থিতিটিকেই প্রাণস্পন্দন ভেবে নষ্টালজিক অনুভূতিতে আচ্ছন্ন হয়। মনোগত বিভ্রমে কখনো কখনো স্বামীর ছায়াশীতল স্পর্শও অনুভব করেন ফাঁকা শূন্য বৃত্তাবদ্ধ জীবনের অসম্পূর্ণতায়। এই গল্পের মা চরিত্রটির তার সন্তান সমেত যে বাড়িতে বসবাস তা নিম্ন মধ্যবিত্তের কোনোরকম মাথা গুঁজবার ঠাঁই–

> দু খানা দশ বারো হাত কামরার সামনে এক চিলতে বারান্দা আর বিশ্রী রকমের ছোট দরজা এক জানালা দিয়ে রান্নাঘর... বারান্দা দিয়ে আকাশ দেখা যায় না... আশেপাশের আবহাওয়া এমনিতর যে, সব সময়ই মনে হয় বাসাটা যেন মুখ ভার করে রয়েছে। (সৈয়দ শামসুল হক, ২০১০ : ৫৯)

মধ্যবিত্তের প্রকৃত সুখ যেন স্বামী, সন্তান এবং ঘর। গল্পটিতে লেখক নারীটির অভাবতাড়িত জীবনে আবেগীয় অনুভূতি, দাম্পত্য নির্ভরতার হাহাকার ব্যক্তির পূর্বাপর জীবনের সাথে বর্তমানে সমান্তরালে তুলনা করে দেখিয়েছেন। গল্পে 'তাস' এক ভয়ংকর আশঙ্কার উপকরণ। তাসের প্রকোপে বাবার অনুপস্থিতে সন্তান বখে যেতে পারে এই বোধ মাকে নিরন্তর তাড়িত করে বেড়ায়, আবার সন্তানকে শাসন করতে গিয়ে ঘুমন্ত মুখাবয়বে স্নেহার্দ্র হয়ে ওঠাটা তাকে পৌঁছে দেয় নারীত্বের উৎকর্ষিক চমৎকারিত্বে। বস্তুত গার্হস্থ্য পারিবারিক গল্প রচনায় সৈয়দ হক মোটামুটি সফল কিন্তু তদাপেক্ষা অধিক সফল মধ্যবিত্ত জীবনের মর্মন্তুদ চিত্র নির্মাণে।

সৈয়দ শামসুল হকের 'পূর্ণিমায় বেচাকেনা' গল্পটি এমন এক ধরনের গল্প যে গল্পে মধ্যবিত্তের বস্তুপ্রিয়তার আকাঙ্ক্ষা প্রকট ও উদগ্র হয়ে ফুটেছে। পিতার উত্তরাধিকারে স্বপ্নপ্রাপ্ত অর্শরোগের ঔষধ বিক্রির দোকান খুলে বসেও অভাবের সাথে এক ব্যক্তির নিত্য বসবাস। এরপরও কোনো এক রহস্যময় ব্যক্তির অপ্রয়োজনীয় যন্ত্র কেনার পেছনে সর্বস্ব বিকিয়ে দিতেও তার দ্বিধা হয় না। সে জানে এই যন্ত্র বিক্রি করার জন্য সে আর নতুন কোনো ক্রেতা খুঁজে পাবে না, তবু সে কেনে। এমনকি লোকটা যন্ত্র নিয়ে এলে তাকে বাকিতে চা-ডালপুরিও খাওয়ায়, বিরতির জন্য যথেষ্ট উৎকণ্ঠাও দেখায়। লোকটিকে বারবার আসার অনুরোধের মধ্য দিয়ে সে তার অ-নিবৃত আকাঙ্ক্ষায় একটু একটু করে এগিয়ে যায় আরো বেশি নিঃস্ব হওয়ার পথে। আদতে যন্ত্রের প্রতি লোকটার এই উদ্বেলতা আমাদের সকলেরই চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। আমরা পুরোপুরি আধুনিক নাগরিক জীবন-যাপনের লক্ষ্যে নিজেদেরকে প্রায় যন্ত্রে পরিণত করেছি। এবং বুঝতেই পারি না যে আমাদের মানবিক জীবন তাতে কতটা বিক্রি হয়ে যাচ্ছে। (আহমাদ মোস্তফা কামাল, ২০১৫ : ২৭৪)। নাগরিক জীবনে টিকে থাকতে গেলে মধ্যবিত্ত যেমন নিরন্তর কিনে যায় তেমনি নিম্ন মধ্যবিত্তদের কেউ কেউ নিরন্তর বেচেও যায়। বেচতে বেচতে সব শেষে ঘরের মানুষও বিক্রি করে শূন্যে মিলিয়ে যেতে পারে তাদের কেউ। এ গল্পের রহস্যময় মানুষ এবং নিঃস্ব হয়ে যাওয়া ব্যক্তিটি দুজনই আমাদের যান্ত্রিক জীবনের অপরিনামদর্শিতার অনিবার্য পরিণতি।

মধ্যবিত্ত শ্রেণির একটা বৃহৎ অংশ পেশাজীবী শ্রেণির। বাংলা কথাসাহিত্যে মধ্যবিত্তের অন্যান্য বিভাজন অপেক্ষা এই পেশাজীবী শ্রেণিই গুরুত্বই সবচেয়ে বেশি। 'গন্তব্য অশোক' গল্পের মূল চরিত্র সামাদ কালিগঞ্জ কলেজের অধ্যাপক। মধ্যবিত্তের নিপাট ভালোমানুষি রূপ তার

বহিরঙ্গে। ভেতরে সে বিকৃত মানসিক বোধে আচ্ছন্ন। নিজের রুচির প্রতি তার মাত্রাতিরিক্ত শ্রদ্ধা থাকার দরুন অন্যের রুচি বা জীবনাচার কোনটাই তার পছন্দ হয় না–

> দিনের বেলায় যে মানুষটিকে মনে হয় স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য কৃতসংকল্প, অধ্যাপনার দায়িত্বে একনিষ্ঠ, বইয়ের পাতায় তন্ময়, প্রকৃতির ঋতুবদলের উৎসাহী সংবাদ সংগ্রাহক, গ্রামে যে কোনো নতুন ঘটনায় কৌতূহলী, সেই মানুষটিকে লণ্ঠণ জ্বালা অন্ধকারে শেয়ালের যোজন পেরুনো অন্ধকারে মনে হয় একখণ্ড জ্বলন্ত সহিংস উলকার মতো ধাবমান পাথর।
> (সৈয়দ শামসুল হক, ২০১০ : ২৬১)

গল্পে শিরিন সামাদের বৈধ নারী হওয়া সত্ত্বেও মধ্যবিত্তের চিরন্তন অহমবোধ সামাদকে সব সময় প্ররোচিত করে নিজ স্ত্রীর ওপর স্ব-অধিকার প্রতিষ্ঠিত করতে। তাই, রাত বা দিন যেকোনো সময়েই তার ক্ষুধার্ত জান্তব আকাঙ্ক্ষা বিকৃত লালসায় ঝাঁপিয়ে পড়ে বিবস্ত্র শিরিনের উপর। নারীর প্রতি পুরুষের এই মনোভাব, ভালোবাসাহীন দৈহিক সম্পর্ক, সন্দেহ– মধ্যবিত্তের এইসব মৌলিক প্রবণতা তৈরি হয়েছে সমাজে দীর্ঘদিন ধরে প্রতিষ্ঠিত থাকা একপেশে পুরুষতন্ত্রের প্রভাবে। পুরুষতন্ত্র মনে করে শ্রেণিভিত্তিক সমাজব্যবস্থায় নারী সব সময়ই পুরুষের অধস্তন বা অপ্রধান স্থানে। নারী-পুরুষের ভূমিকা লিঙ্গীয় বিন্যাসের দ্বারা সামাজিকভাবে নির্ধারিত, গঠিত এবং আরোপিত (বিলকিস রহমান, ২০১৩ : ১৮) যেখানে সমস্ত মধ্যবিত্তের চার দেয়ালের অস্তিত্বই এমন ঘুণে ধরা, পলেস্তরা খসা, সেখানে সামাদ আর শিরিনের দাম্পত্য জীবন এর চেয়ে কী আর এমন ব্যতিক্রম হতে পারে।

নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবারের উঠতি যুবকদের ইন্দ্রিয়জ সুখ-অসুখের গল্প 'পতন'। এই গল্পে সামাদ বেলাল, ফজলু ও বাদশার জীবনের কালো অন্ধকারকে লেখক বাইরে এনেছেন মনস্তাত্ত্বিক জিজ্ঞাসায়। পাপ আর পতনের পারস্পরিক সম্পর্কে তিনি চরিত্রের ভেতর থেকে টেনে এনেছেন অনুতাপ। বিবেকের দংশনে তারা নিজ নিজ সত্তার কাছে উন্মোচিত করেছে তাদের পাপের আমলনামা; বেশ্যাপল্লিতে গমন কিংবা সুযোগ পেয়ে রাতের অন্ধকারে অসহায় কোনো রমণীকে পুনঃপুন ধর্ষণে যে সুখপ্রাপ্তি তা আদতে অসুখ এই সত্য তারা অনুধাবন করে। তাদের এই নিরন্তর পাপের দিকে ধাবিত হওয়ার মধ্যে আছে এই পুঁজিবাদী সমাজের চরম অবক্ষয়ের কষাঘাত। চার যুবকই জীবন নিয়ে হতাশ এবং মনোবৈকল্যের সংকটে নিপতিত। তাদের অর্থহীন জীবনের পেছনে অনুসংঘটক হিসেবে কাজ করেছে রাষ্ট্র, সমাজ ও পরিপার্শ্বের পরিচর্যাহীনতা। তাই সময় সময় অনুতাপের সঙ্গে সঙ্গে তাদের ভেতর জেগে ওঠে আক্ষেপ–

> আমাদের চাকরি নাই, ব্যবসা নাই, টাকা নাই, দেশেও কোন শান্তি নাই, সুযোগ নাই, স্থিরতা নাই, জগৎ যেন এমন আমাদের জন্য সে আমাদের নয়, আর সকলের। আমরা গুড় দিয়ে রুটি খাচ্ছি, যেন লবণ জড়ানো আহার খাই, গুড়ের মধ্যে আরো কয়েকটা ডেয়ো পিঁপড়ে দেখা যায়। আমরা খুটে খুটে তুলি, যেন অনেক আগেই আমাদেরও কেউ খুটে খুটে এভাবে তুলে ছুড়ে ফেলে দিয়েছে এই দেশ থেকে। আমরা মৃত চলৎশক্তিহীন পড়ে আছি মাটিতে, আর অচিরেই দ্যাখো লাল পিঁপড়ে উঠে আসছে, তারা কালো ডেয়োগুলোর চারদিকে দল বাঁধছে, গুড়ের লোভে নাকি মৃত ডেয়োগুলোর লোভে? তবে বুঝি পিঁপড়েই পিঁপড়ে খায়, মানুষ মানুষকে খায়। মানুষের স্বপ্ন মানুষেই এসে খেয়ে ফেলে। (সৈয়দ শামসুল হক, ২০১০ : ৫৪৯)

পতন গল্পে নিম্নমধ্যবিত্ত সমাজে নারীকে পাপের উপকরণ হিসেবে বিবেচনা করার প্রচলিত বিশ্বাস সংক্রান্ত সংকটের বিপরীতে লেখক তাঁর মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গি স্পষ্ট করেছেন, নারী একাই

শুধু পাপের আঁধার নয় বরং পৃথিবীর সৃষ্টির শুরু থেকেই নারী ও পুরুষ উভয়ই একই সাথে বহন করছে একই অন্ধকার-একে এড়ানোর বিকল্প কোন উপায় নেই।

মধ্যবিত্তের সুখ নির্ভর করে একটা গোছানো চাকুরির ওপর। কিন্তু এই চাকুরিপ্রাপ্তি ও চাকুরিচ্যুতি নিয়েও মধ্যবিত্ত জীবনে রয়েছে নানাবিধ সংকট। কর্মহীন বেকার যুবক আশরাফের মনোকষ্ট আর তার জীবনে ঘটে চলা নিদারুণ বাস্তবতা নিয়ে রচিত 'নাম' গল্প। বন্ধু হুরমত আলীর কাছ থেকে কোট ধার করে নিয়ে আশরাফ চাকরির জন্য ইন্টারভিউ দিতে যায়। হুরমতের কোট গায়ে দিয়ে নিজেকে সে মনে মনে হুরমতই মনে করে। কোটের উষ্ণতা তাকে জীবনের উষ্ণতা আর সচ্ছলতার স্বপ্ন দেখায়। দিনের পর দিন টাকার জন্য দরখাস্ত পাঠাতে পাঠাতে মানসিকভাবে বিপর্যস্ত আশরাফ অনেকটাই হতবিহ্বল ছিল সেসময়। হুরমতের অফিসে গিয়ে, তার প্রাত্যহিক কাজকর্ম দেখে, তার কথা শুনে হুরমতকে তার স্বপ্নের নায়ক বলে মনে হয়। স্বপ্নগ্রস্ত আশরাফ কোট গায়ে দেবার পরই ভাবতে থাকে–

> এবারে মাইনে পেয়েই এ রকম একটা কোট করতে সে দেবে। এতদিন যেন সে স্পষ্ট বুঝতে পারে হুরমত আলীর সঙ্গে তার ব্যবধান শীতের সঙ্গে উষ্ণতা। আশরাফের একটা প্রবল আকাঙ্ক্ষা হয় উষ্ণতার জন্য। ধার করা উষ্ণতায় গা ডুবিয়ে সে স্বপ্নগ্রস্তের মতো পথ চলতে থাকে। (সৈয়দ শামসুল হক, ২০১০ : ১৭৩)।

আর্থিকভাবে পঙ্গু নিম্ন মধ্যবিত্তের এই ক্ষুদ্র স্বপ্নের অলৌকিক প্রত্যাশা সৈয়দ হক দেখেছেন দরদের চোখে।

'নাম' গল্পের মতোই সৈয়দ শামসুল হকের 'শীতবিকেল' গল্পেও আছে মধ্যবিত্তের অস্তিত্বের সংকট। এই গল্পের নায়ক আনু। তার বাবা-মা ও ভাই-বোনদের নিয়ে রচিত পারিবারিক সুখ দুঃখের গল্পে তার বাবাই নায়ক, যে পুলিশের দারোগা। এই চাকুরিতে সংসারে সচ্ছলতা নেই তার। সৎ লোক অন্যায় করতে পারেন না। বড়ো ছেলে পানুর রেলের চাকুরি হলে একদিন সব সংকট কেটে যাবে সেই আশাও নষ্ট হয়ে যায় পানুর রেলে কাটা পড়া দুর্ঘটনার মধ্য দিয়ে। আনুর বোনেরা বড়ো হয়, বাবা ভালো বিয়ে দিতে পারে না তাদের। অভাবের জন্য পানুর বাবা ঘুষ নেন একদিন, এবং সেই অপরাধে তাকে জেলে যেতে হয়। আনুর ভাষ্যে–

> তারপর থেকে গোটা বাসা কেমন বদলে গেল। দেখেছি মাঝে মাঝেই মা একেলা এক কোণে বসে ভীষণভাবে কাঁদেন। কিন্তু বাবাকে আর কোনোদিন কাঁদতে দেখিনি। আমার চোখেও এড়ায়নি যে, বাবার ভেতরে এক বিরাট পরিবর্তন এসেছে। আর কোনোদিন ভোরে তাঁকে সেই হাসিভরা উজ্জ্বল মুখ নিয়ে শিউলিতলার পথে পায়চারি করতে দেখিনি। কতকাল ভোরে বাবার মিষ্টি গলার সুর শুনতে কান পেতেছি। কিন্তু শুনতে পাইনি। যাও শুনেছি, তা আমার কাছে এত করুণ আর কান্না কান্না ভেজা ঠেকেছে যে, আমি পালিয়ে বেঁচেছি। (সৈয়দ শামসুল হক, ২০০১ : ২৬)।

মূলত মধ্যবিত্তের যে চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য সেখানেই আনুর বাবার পরাজয় সুনিশ্চিত ছিল কেননা একজন নির্বিত্ত মানুষকেও কেবল শিক্ষার জোরেই টানতে হয় মধ্যবিত্তের জীবন। সেখান থেকে বিচ্যুত হওয়া মানেই একক ব্যক্তিত্বের পতন এবং সামষ্টিক পরিবারেরও পতন।

মধ্যবিত্ত পরিবার ও সমাজে এমন কিছু মানুষ থাকে যারা যূথবদ্ধ থেকেও অপরিসীম শূন্যতায় কাটিয়ে দেয় খরতপ্ত জীবন। বহির্জগতের পারিপার্শ্বিক হাওয়া যখন মধ্যবিত্তের অস্তিত্বে নিজেকে অপ্রয়োজনীয় করে তোলে তখন তাদের ভেতরে কাজ করে বিচ্ছিন্নতা। প্রকৃতি

বিচ্ছিন্নতা, পরিবার বিচ্ছিন্নতা, প্রেম বিচ্ছিন্নতা, সমাজ বিচ্ছিন্নতা, ঈশ্বর বিচ্ছিন্নতা, মূল্যবোধ বিচ্ছিন্নতা, সত্তা বিচ্ছিন্নতা– বিচ্ছিন্নতার এরূপ রূপান্তর ব্যক্তিচৈতন্যে সৃষ্টি করে নৈঃসঙ্গের উপলব্ধি। (বিশ্বজিৎ ঘোষ, ১৯৯৭ : ২৯) সৈয়দ শামসুল হকের 'তৃষ্ণা' গল্পটিতে মধ্যবিত্তের আত্ম অবদমনজাত ক্রন্দন এতটাই তীব্র যে মূল চরিত্রের স্বেচ্ছা নির্বাসিত জীবনের কোথায় যেন জীবনের কোলাহলময় সুর-ছন্দের অভাবে হৃদয়ে জাগে হাহাকার। এই গল্পের নায়ক ইউসুফ। তার ভেতরে দ্বৈত সত্তা সর্বদাই ক্রিয়াশীল। প্রেমের ব্যর্থতা তার ভেতরে প্রতিশোধ বা ঈর্ষার জন্ম দেয়নি বরং দার্শনিক প্রশ্নে নিজের আত্মাকে করেছে বিক্ষুব্ধ। ইউসুফের দুঃসহ যন্ত্রণা যাকে ঘিরে, সেই অধরা প্রেম তাকে অনুভব করে না। দুজনের দূরত্ব চৈতন্যে। সম্ভাবনাময় চিত্রশিল্পী হয়ে যে প্রতিদিন আঁকেন প্রেমিকার মুখাবয়ব। পরদিন আবার স্প্যাচুলা দিয়ে ছেঁচে ফেলে সব। কী এক ব্যর্থ আকাঙ্ক্ষা শিল্পী ইউসুফের মনোজগতে। প্রেমিকার মাতৃত্বের সংবাদে তার ভেতরে যে শূন্যতা তৈরি করে তা তার চেতনায় দেয় সর্বস্ব হারানোর নির্মম কষ্ট–

> ফিস ফিস করে কে যেন তার কানে বলে ইফ আই ওয়ান টু পারসনস যদি আমি দুজন হতাম– এক আত্মা, এক অনুভূতি কেবল দুটো শরীর। ইফ আই ওয়ান টু পারসনস যদি আমি দুজন হতাম– এক আত্মা, একক অনুভূতি কেবল দুটো শরীর। ইফ আই ওয়ান– দুজন দুজন। আর কত বাকি এই পাহাড়ের ধূসরতাকে রক্তিম করে একটি চাঁদ উঠবার? একটি জন্ম! (সৈয়দ শামসুল হক, ২০১০ : ১৫৭)

আদতে ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তির তীব্র প্রতিযোগিতা আধুনিক যুগে এসে মধ্যবিত্তের নিরবচ্ছিন্ন একা হয়ে উঠার পথ তৈরি করে দিয়েছে। বাহ্যিক দ্বন্দ্বের প্রভাব ব্যক্তির অন্তর্জগতে নানামুখী জটিল চিন্তাসূত্র ঈর্ষা, ক্রোধ ও হীনম্মন্যতা ইউসুফদের মতো মানুষকে করে দিয়েছে শেকড়চ্যুত অপুষ্ট মানুষ।

ব্যক্তিক অপ্রাপ্তি বা গার্হস্থ্য সুখ-দুঃখের বাইরে সমাজস্থ মধ্যবিত্তের সামগ্রিক সংকট সৈয়দ শামসুল হক অবলোকন করেছেন নিজ জীবন অভিজ্ঞতার অভিজ্ঞান রূপে। যাপিত জীবনের টুকরো টুকরো তৈরি হওয়া নানাবিধ প্রতিবন্ধকতা তাঁর গল্পে প্রাণ পেয়েছে সহজ স্বাভাবিকতায়। মধ্যবিত্তের জীবনে বহমান এইসব সংকট শুধু ঘরের চারদেয়ালের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে না বরং তাদের দ্বিধাগ্রস্ত মানসিক বোধের কারণে তারা তাদের বিচরণ ক্ষেত্রেও জন্ম দিয়ে চলে নানাবিধ প্রতিকূল পরিস্থিতি। ভালো-মন্দ, ন্যায়-অন্যায় নির্ণয়ে তারা নিয়তই হয়ে উঠে বিভ্রান্ত। এরূপ একটি গল্প 'পরাজয়ের পর'। একজন নামহীন মাতালের মুখে বর্ণিত হয়েছে গল্পটি। সে এমন একজন কে গল্পটা বলছে যাকে সে ভাইজান সম্বোধন করে। আগের রাতে প্রচুর মদ খেয়ে মাতাল হয়ে গল্পের বর্ণনা করে। দুজন লোককে সে রাস্তায় মারামারি করতে দেখে। একজন সাদা জামা গায়ে, আরেকজন নীল জামা গায়ে। নীল জামার দুরবস্থা দেখে সে তার পক্ষ নেয় এবং সাদা জামা পরাস্ত হয়। পরে সেখানে জড়ো হওয়া লোকদের কাছে জানতে পারে। নীল জামাই অপরাধী। নিজেকে অপরাধী ভাবে। মাতাল হয়। সাদা জামার বোন কলেজে পড়ত। কলেজ থেকে বাড়ি আসার পথে নীল জামা তাকে ডাকে। সে অবস্থাপন্ন। গাড়ি আছে। নীল জামাকে মেয়েটা ভাইয়ের বন্ধু হিসেবে ভাই ভেবেছিল। অথচ নীল জামা মেয়েটার সর্বনাশ করতে যাচ্ছিল। সাদা জামা টের পেয়ে নীল জামার ওপর চড়াও হয়। এ সময় গল্পের প্রধান চরিত্রটি রক্ষা করে নীল জামাকে, আর শাস্তি দেয় সাদা জামাকে। প্রকৃত ঘটনা শোনার পর সে বিমর্ষ হয়ে পড়ে, ভাবে নিজের মুখ কখনো কখনো হয়তো আয়না ছাড়াই দেখা যায়। সে তেমনি নিজেকে দিব্য চোখে দেখতে পায়। তার মুখ পাথরের মতো কঠিন। এবং বুঝতে পারে পার্লামেন্টে জিতে যাবার পরও মন্ত্রীদের

মুখ কেন জগদ্দলের পাথরের মতো দেখায়। তার ভাষ্যে– "চোরের মত এক পা এক পা করে পিছিয়ে এলাম আমি। ভিড় থেকে বেরুলাম। কেউ আমাকে লক্ষ করল না? কারণ, তারা রসের সন্ধান পেয়েছে।" (সৈয়দ শামসুল হক, ২০১০ : ১৮৯) এখানে মধ্যবিত্তের যে কাপুরুষতা, প্রকৃত সমস্যার স্বরূপ না জেনেও সংকট তৈরি করার প্রবণতা সে দিকটা লেখক দেখিয়েছেন সূক্ষ্ম বাস্তবতায়।

নাগরিক মধ্যবিত্তের এরূপ নানাবিধ উপলব্ধিজাত অনুভূতি নিয়ে সৈয়দ শামসুল হকের আরেকটি উল্লেখযোগ্য গল্প 'আনন্দের মৃত্যু'। এক পানশালায় দুই খদ্দের আনন্দ খুঁজতে যাওয়ার এক নাটকীয় আবহ উঠতি পুঁজিবাদী শ্রেণির ভেতরকার অন্তঃসার শূন্যতাকে প্রকাশ করে। প্রতিনিয়তই যেন মানুষ পুরোনো আনন্দ বাতিল করে নতুন আনন্দ তৈরিতে ছুটে চলছে দিগ্বিদিক। দুটো চরিত্র পরস্পর পরস্পরকে বন্ধু নামে সম্বোধন করে কিন্তু সেই বন্ধুত্ব রক্ষায় তাদের কোনো উৎসাহ নেই। সবকিছুতেই তাদের মতদ্বৈততা কেবল একটি বিষয়ে তারা এক 'যখন একজন আরেকজনকে বলে– 'না জীবনে আর স্ফূর্তি নেই'। কেবল তখনই আরেকজন প্রতিবাদ করে না, মেনে নেয় সত্যিটা। একটি নিঃশ্বাস ফেলে মাথা নাড়ে। প্রতিধ্বনির মতো কণ্ঠস্বর করে বলে না জীবনে আর স্ফূর্তি নাই।' (সৈয়দ শামসুল হক, ২০১০ : ১৭৫) তীব্র গতানুগতিকতা, পুনরাবৃত্তির জীবনে আনন্দ আনতে তারা পানশালায় আসে, মদ খায়, মাতাল হয় কিন্তু আনন্দ আসে না। আসলে নাগরিক জীবন এমনই। এর উপরিতল যাই হোক বহিঃস্থে সে জীবন ফাঁকা, শূন্য।

দ্রুত নগরায়ণ প্রক্রিয়ায় মানুষ যতই বাড়ছে ততই তাদের টিকে থাকার সংগ্রাম হয়ে উঠেছে কঠিন থেকে কঠিনতর। সঙ্গে আছে নৈতিকতার স্খলন। ঢাকা শহরে নিম্ন মধ্যবিত্তদের ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি মধ্যবিত্তের সুপ্রতিষ্ঠিত নৈতিকতা চর্চার ইতিবাচক স্বভাবকে কখনো কখনো ফেলে দিয়েছে ঝুঁকির মধ্যে। আবার চরম ক্ষয়ে যাওয়া বিবেকেও কখনো কখনো হঠাৎ সৃষ্টি হয়েছে কর্তব্যের বোধ। এরূপ একটি গল্পের উদাহরণ 'যদি জানতে চান' গল্পটি। গল্পের নায়ক একজন চোর দাগি আসামি, গুণ্ডা, পকেটমার, মাতাল, লম্পট, সব রকম বিশেষণে বিশেষিত। লোকটির বহুরূপ পরিচয় এবং কর্মকাণ্ডের ভিত্তিতেই গল্পের প্লট।

লোকটার বাড়ির পাশে সুন্দরী ছোটো বউ তার হার ফিরিয়ে আনতে অনুরোধ করে। জুয়া খেলে ছোটো বউয়ের স্বামী হারটি হেরে এসেছে। অলংকারের জন্য জন্য ছোটো বউ এসেছে লোকটার কাছে। অপূর্ব সুন্দরী ছোটো বউকে দেখে লোভে তার জিভ চকচক করে ওঠে। সে তার চোর ওস্তাদের কাছ থেকে একটা হার এনে ছোটো বউকে একটা গোপন জায়গায় ডেকে নিয়ে ভোগ করতে চায়। নানা অজুহাত দেখিয়ে ছোটো বউকে সেখানে নিয়ে যায়, এ প্রসঙ্গে এ গল্পের কিছু অংশ উল্লেখ করা যায়–

> ওকে দেখানোর জন্যই, যেন বাড়ি যাচ্ছি এমন ভান করে, বড় রাস্তা পর্যন্ত গেলাম তারপর চোরা চোখে দেখলাম, হামিদটা ইন। তখন অন্ধকারে মিশে জজের মায়ের ছাপড়ার পাশে এসে দাঁড়ালাম।
>
> এতক্ষণ কি করছে ছোট বউ? ভয়ে বোধ হয় হাত পা পেটের মধ্যে সেঁধিয়ে গেছে। তা যদি যায়, তো চমৎকার। বেশি লড়াই করতে হবে না। (সৈয়দ শামসুল হক ২০১০ : ২০৩)

তবে শেষ পর্যন্ত সে কিছুই করতে পারে না। কারণ এই প্রথম কেউ তাকে ভরসা করে কোনো কাজ করার দায়িত্ব দিয়েছে। গল্পটি মূলত মধ্যবিত্তের বিবেকের ভেতর যে চিরন্তন সত্য-

অসত্য, ন্যায়-অন্যায়ের বোধ ক্রিয়াশীল থাকে তার দার্শনিক রূপায়ণ। আদতে সৈয়দ শামসুল হকের গল্পের প্রধান আশ্রয় ভগ্নপ্রায় মধ্যবিত্ত, যারা না মধ্যবিত্ত না নির্বিত্ত। তারা সকলেই অসম সামাজিক বিকাশে ক্ষতিগ্রস্ত ও বিপর্যস্ত। যাদের সামাজিক সংকট ব্যক্তি মানসে তীক্ষ্ণ সংকট হিসেবে প্রকাশিত। (মোস্তফা তারিকুল আহসান, ২০০৮ : ৪০২)

নাগরিক মধ্যবিত্তের সুবিধাবাদের গল্প 'অভিনেতা রূপে আবদুল খালেক'। এই গল্পের খালেক উঠতি পুঁজিপতিদের একজন যে খুব ভালোভাবে জানে মধ্যবিত্তের প্রকৃত চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। তারা উপরে উপরে শিল্প-সাহিত্যের চর্চা করলেও ভেতরটা তাদের আত্মস্বার্থ সর্বস্বতায় টনটনে। ঢাকার গ্রুপ থিয়েটার 'নাট্যশালা' এবং তাদের ভেতরগত কোন্দলে সৈয়দ শামসুল হক দেখাতে চেয়েছেন এই শিল্প করা শিল্পীরা স্বার্থের কাছে কতটা মূল্যবোধহীন। কিন্তু নাটক ঢাকার মধ্যবিত্ত শ্রেণির কাছে কেমন গুরুত্বপূর্ণ তা আবদুল খালেক ও তার সাংবাদিক বন্ধুর কথোপকথনের মধ্য কিছুটা আভাস তুলে দিয়েছেন—

> নাটকে নামছ? নাটকে অভিনয় করছ তুমি?
>
> আবদুল খালেক বাঁকা চোখে আমাকে একনজর দেখে বলল, মনে হয়, অভিনয় তুমি খাটো চোখে দেখো মিঞা?
>
> অভিনয় আমি খাটো চোখে দেখব কেন? ইয়োরোপ আমেরিকার কথা ছেড়ে দাও, আমাদের এই বাংলাদেশে, এই ঢাকাতে নাটকের চর্চা, নাটকে অভিনয়, এসব সিরিয়াস কাজ, প্রয়োজনীয় কাজ, শিল্পের কাজ, সম্মানের কাজ বলে আমরা মনে করি। (সৈয়দ শামসুল হক, ২০১০ : ৪০৩)

তথাপি আবদুল খালেক ঢাকার বুকে নাটক করে বেড়ানো ভানসর্বস্ব নাট্য সংগঠকদের উপযুক্ত শিক্ষা দিতে চেয়েছেন বলে অর্থের প্রতাপে নিজে হয়ে ওঠে এই ভাঙাচোরা পাঁচ ভাগে বিভক্ত হওয়া দলের প্রধান অভিনেতা। এমনকি দলের প্রেসিডেন্ট হওয়ার সম্ভাবনাও রয়ে যায় তার। তিনি জানেন তাকে শুষে নেয়ার জন্যই দলের ভেতর তার এত কদর। শিল্পের জন্য নয় যেন শিল্পপতি হওয়াটাই তার যোগ্যতা। অবশেষে আবদুল খালেক নাট্যশালা গ্রুপ থিয়েটারকে শিক্ষা দিতে সক্ষম হয়। কিন্তু গল্পের পরিসমাপ্তিতে বাংলাদেশের রাজনৈতিক মাঠে যে বহুদলীয় কোন্দল তাকে শিক্ষা দেবে কে এই প্রশ্নের অমীমাংসিত সংকট উত্থাপন করেই গল্পের ইতি টানেন। আসলে মধ্যবিত্তের মানস প্রবণতায় যে কয়টি ত্রুটিপূর্ণ বৈশিষ্ট্য অনৈতিক সামাজিক সংকট তৈরি করে তার মধ্যে স্বার্থ ও সুবিদাবাদ সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য।

মধ্যবিত্ত শ্রেণির মধ্যে আমরা শুধু স্বার্থ, সুবিধা, হতাশা, ক্লান্তি বা নৈতিক অধঃপতনই খুঁজে পাই তা নয়, বরং সমাজ ও রাষ্ট্রিক পরিবর্তনে নিজের অংশগ্রহণের সক্রিয়তাও লক্ষ করি। তবে এই সক্রিয়তা মধ্যবিত্ত শ্রেণির সংকটাপন্ন জীবনকে আরো সংকটের দিকে নিপতিত করে। 'সম্রাট' গল্পে জহির সাহেবের ব্যক্তিত্ব ও তাঁর পারিবারিক অবস্থার বর্ণনা থেকে মধ্যবিত্তের এক চিরন্তন রূপ ধরা পড়ে। স্ত্রী-পুত্র-কন্যা নিয়ে জহির সাহেবের সংসার। পারিবারিক জীবনে তাঁর সুখী হবার কথা। কিন্তু দু'বছর আগে দুর্ঘটনায় পঙ্গু হয়ে যাবার পর সংসারের লাগাম যেন তাঁর হাত থেকে ছিটকে যায়। মেজাজি জহির সাহেবকে ছেলে-মেয়েরা ভয় পায়, তবে তারা তাঁর আড়ালে অন্যভাবে বেড়ে ওঠে। বড় ছেলে শাহেদকে নিয়ে তাঁর সংশয় শেষ পর্যন্ত সত্যি প্রমাণিত হয়। ইউনিভার্সিটিতে পড়ার সময়ে সে রাজনীতিতে জড়িত হয় এবং বাড়িতে একদিন পুলিশ এলে তিনি নিজে ছেলেকে ধরিয়ে দেন পুলিশের হাতে। নিজের পঙ্গু হবার কষ্টের চেয়ে এই কষ্ট আরো বড়। পঞ্চাশ দশকে ঢাকাকেন্দ্রিক মধ্যবিত্ত শ্রেণির পারিবারিক জীবনের এই গল্প আমাদের সামগ্রিক রাজনৈতিক সাংস্কৃতিক জীবনের প্রতিনিধিত্ব করলেও রাজনৈতিক সম্পৃক্ততা মধ্যবিত্ত

শ্রেণির দৃঢ় পারিবারিক বন্ধনে ফাটল তৈরি করে, যার ফলে জহির সাহেবের মধ্যে শুরু হয় আত্মিক সংকট। এই গল্পে শাহেদ, স্ত্রী মরিয়ম এবং অন্যরা জহির সাহেবের মানসিক সংকটকে পারিবারিক সংকটে রূপান্তরিত করেছেন। জহির সাহেবের শারীরিক পঙ্গুত্বকে মানসিক পঙ্গুত্বের প্রতীকে দেখিয়েছেন লেখক। তাঁর ব্যক্তিজীবনের অসহায়ত্ব লেখকের বর্ণনায়–

> শাহেদের দৃষ্টিতে কী ছিল? ভয় না ঘৃণা? জহির সাহেব আর ভাবতে পারেন না। টলতে গিয়ে আরাম চেয়ারে বসেন। ঘৃণা? ওর সামনা সামনি দাঁড়িয়ে মনে হচ্ছিল তিনি যেন লকলকে আগুনের অতি কাছে দাঁড়িয়ে আছেন, গায়ে আঁচ লাগছে তার। মনে হয়েছিল ভাবতে ভয় করে। সব তালগোল পাকিয়ে আসে! (সৈয়দ শামসুল হক, ২০১০ : ২০)

আদতে বিভাগোত্তর ছোটোগল্পে মধ্যবিত্ত শ্রেণির যে রূপ আমরা পাই তাতে তাদের রাজনৈতিক সম্পৃক্ততা একদিকে মধ্যবিত্ত শ্রেণির অধিকার ও আত্মপ্রতিষ্ঠার জায়গাটিকে যেমন দৃঢ় করেছে তেমনি ব্যক্তিগত জীবনকে করে তুলেছে সংকটাপন্ন। তারপরও যে শ্রেণি সময়ের বৈরিতাকে সব সময় অতিক্রম করতে চায় বলেই তারা মধ্যবিত্ত। সৈয়দ শামসুল হকের ছোটোগল্প বুকের ভেতর আশাবৃক্ষ তেমন। এ গল্পের দর্শন–

> রাজনৈতিক টানাপড়েন, বেকার সমস্যা, চাকুরির সংকট, সামাজিক নিরাপত্তার অভাব ইত্যাদি ছিল লেখকের প্রধান লক্ষ্য। অনন্ত জীবনপ্রবাহে কোথাও ক্ষত থাকবে এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু সেখানেই তো শেষ নয়। জীবন তো স্থবির না। গভীর অন্ধকারেও মানুষ আলোর আকাঙ্ক্ষায় ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়ে থাকে। (অনিরুদ্ধ কাহালি, ২০১৫ : ১৬)

অর্থাৎ লেখকের অনুসন্ধিৎসা, পরিশ্রম আর পর্যবেক্ষণ আমাদের বহমান জীবনের সহস্র ধারার সংকটের মধ্য থেকে মধ্যশ্রেণির সামাজিক রাজনৈতিক আর অর্থনৈতিক বাস্তবতা হতে উদ্ভূত মনস্তাত্ত্বিক বাস্তবতা সময়ের বিশ্বাসযোগ্য উপস্থাপনে পাঠক হৃদয়ে সত্য অনুভূতির অনুরণন তুলতে সক্ষম হয়েছে।

মোটের ওপর সৈয়দ শামসুল হক মধ্যবিত্তের জীবনকে যেভাবে প্রত্যক্ষ করেছেন তাতে কখনো সে জীবন উৎকট আত্মকেন্দ্রিকতার দ্বারা পীড়িত, কখনো স্বার্থপরতায় সংকীর্ণ আত্মদ্বন্দ্বে জর্জরিত। ঈর্ষা, পরশ্রীকাতরতার প্রতিরোধহীন মনোবিকৃতির চাপে কখনো সে জীবন হয়েছে আচ্ছন্ন এবং পতিত। নাগরিক বিলাস বিভ্রমের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করতে না পেরে যে জীবন হতাশায় পর্যবসিত, কিংবা অসম যৌন-বিকৃতি দ্বারা যে জীবন আক্রান্ত সে জীবনের গ্লানির দহনে সন্তপ্ত অনুভব তাঁর ছোটোগল্পে প্রণিধান। তাই তাঁর ছোটোগল্পের সংকটাবর্তে নিপতিত মধ্যবিত্ত জীবন পর্যবেক্ষণ সহজ এবং স্বাভাবিক।

সহায়কপঞ্জি

অনিরুদ্ধ কাহালি (২০১৫)। 'সৈয়দ শামসুল হকের গল্প বুকের মধ্যে আশাবৃক্ষ', (সম্পাদক : আহমেদ বাসার)। *অক্ষৌহিণী*, ঢাকা।

অনির্বাণ বন্দ্যোপাধ্যায় (২০১৭)। 'মধ্যবিত্ত বাঙালির স্ফুরণ ও বাংলা চলচ্চিত্রে তার প্রতিরূপ', *মধ্যবিত্ত বাঙালি অন্তরমহল*, (সম্পাদনা : খোকন কুমার বাগ ও রঙ্গনকান্তি জানা)। রক্তকরবী, কলিকাতা।

আবদুল মওদুদ (২০১১)। *মধ্যবিত্ত সমাজের বিকাশ সাংস্কৃতিক রূপান্তর*। মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা।

আহমাদ মোস্তফা কামাল (২০১৫)। 'সৈয়দ হকের গল্প : জীবন ও পৃথিবীর চেনা-অচেনা কোণে বহুবর্ণিল আলো'। *জলেশ্বরীর জাদুকর*। কথাপ্রকাশ, ঢাকা।

খালেদ হোসাইন (২০১৯)। 'সৈয়দ শামসুল হক : শ্রদ্ধাঞ্জলি'। *ভাষা-সাহিত্যপত্র*, ৪৫তম সংখ্যা, বাংলা বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়।

জিনাত আরা হক (২০১৪)। 'মধ্যবিত্ত শ্রেণির বর্তমান ও ভবিষ্যৎ : পরিপ্রেক্ষিত বাংলাদেশ'। *বাংলা একাডেমি পত্রিকা* (সম্পাদক : শামসুজামান খান)। ৫৮ বর্ষ : ১ম-২য় সংখ্যা, বাংলা একাডেমি, ঢাকা।

গোলাম কিবরিয়া ভূঁইয়া (২০০৩)। *বাংলায় মুসলিম মধ্যবিত্ত শ্রেণীর বিকাশ*। খান ব্রাদার্স অ্যান্ড কোম্পানি, ঢাকা।

বদরুদ্দীন উমর (১৯৮৮। *বাংলাদেশের মধ্যবিত্ত ও সাংস্কৃতিক পরিস্থিতি*। পল্লব পাবলিশার্স, ঢাকা।

বিনয় ঘোষ (২০১৬)। *বাংলার নবজাগৃতি*। হাওলাদার প্রকাশনী, ঢাকা।

বিলকিস রহমান (২০১৩)। *উনিশ শতকে বাংলায় নারী পুরুষ সম্পক*। বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

বিশ্বজিৎ ঘোষ (১৯৯৭)। *বুদ্ধদেব বসুর উপন্যাসে নৈঃসঙ্গ্য চেতনার রূপায়ণ*। বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

মুহম্মদ ইদরিস আলী (১৯৮৫)। *বাংলাদেশের উপন্যাস সাহিত্যে মধ্যবিত্ত শ্রেণী*। বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

মোস্তফা তরিকুল আহসান (২০০৮)। *সৈয়দ শামসুল হকের সাহিত্যকর্ম*। বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

মোঃ মুস্তাফিজুর রহমান (২০০৯)। *বাংলাদেশের ছোটগল্পে মধ্যবিত্ত জীবনের রূপায়ণ*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

শোভনলাল দত্তগুপ্ত (১৯৯০)। *মার্কসীয় রাষ্ট্রচিন্তা*। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, কলিকাতা।

সেলিনা হোসেন (২০১৫)। 'কথাশিল্পী সৈয়দ শামসুল হক', *জলেশ্বরীর জাদুকর*, (সম্পাদক : শামসুজ্জামান খান ও অন্যান্য)। কথাপ্রকাশ, ঢাকা।

সৈয়দ শামসুল হক (২০১০), *গল্পসমগ্র*। অনন্যা, ঢাকা।

Karl Marx & Friedrich Engles (2018). *The Communist Manifesto*. Vintage, London.